বৃষ্টিগাছের তলায়
মুজিব মেহদী

বৃষ্টিগাছের তলায়

মুজিব মেহদী

বৃষ্টিগাছের তলায়
মুজিব মেহদীর উভলিঙ্গ রচনা

BENEATH THE RAIN TREE
The androgynous texts of Muzib Mehdy

প্রকাশকাল
জুন ২০০৬

প্রকাশক
বাংলাপ্রসার, ঢাকা
banglaprosar@gmail.com

প্রচ্ছদ
লিন্ডা ব্লিক-এর উওমেন উইথ লিভস অবলম্বনে
মিরাজ মৃত্তিক

পরিবেশক
লিটলম্যাগ প্রাঙ্গণ
৭৯ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা

২০ টাকা

যাদের নিয়ে গাছতলার সংসার

অতৃপ্ত জনরোষ প্রায়শ আত্মকলহে মাতে ০৫

আত্মপক্ষ সমর্থনের মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ থাকাটাই স্ব-মূল্যায়নের সবচে' বড়ো সীমাবদ্ধতা ০৭

তুঁতনির্ভর গুটিপোকা থেকে প্রাপ্ত ধারণারও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবহার সম্ভব ১১

প্রকৃত বীক্ষণকৌশলী হতে পারা একটি বিরল গুণ ১৫

লতা বাওয়ার কাজবাজ প্রায়শই জাদু বাস্তবিক হয়ে যেতে চায় ১৭

আ ফ্রেন্ডলি-বোম্বিং অথবা প্রদর্শনীতাঁবুতে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছারা খুব মূর্ত হয়ে ওঠে ২০

যত্রতত্র খোলে না বাঁশির গলা ২৩

নদীই কলাজ্ঞানের সেরা শিক্ষক ২৪

বলাবলির কেন্দ্রাতিগ মোটিফই বলনকেতার পথপ্রদর্শক ২৬

অচেনা বন্দরের প্রতি প্রেম হলো আবিষ্কারেচ্ছার জনয়িত্রী ২৮

ভীতি-সংশয় আর তাদের অনায়ত্ত ছানাপোনারা শুভযাত্রা আগলে দাঁড়ায় ৩১

আন-উচ্ছ্বাস

কাব্য

মমি উপত্যকা (২০০১)

উনাখ্যান

শ্রেণিকরণ এমন এক সংকীর্ণতা যা সৃষ্টির মহিমাকে ম্লান করে দেয় (২০০৩)

অনুসন্ধান

মাদ্রাসা শিক্ষা : একটি পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা (২০০১)

হাওর : জলে ভাসা জনপদ (২০০৫)

ইকোপার্ক উন্নয়ন : জীববৈচিত্র্য রক্ষার নামে জীবন ও প্রতিবেশ বিনাশী তাণ্ডব (২০০৫)

মুক্তিযুদ্ধ ও নারী (রোকেয়া কবীরের সঙ্গে যৌথভাবে, ২০০৬)

বিগতযৌবনা গণবনিতার মতো ক্লান্ত নিরীহ ছিল সেই গাছ বনতলী ঘেঁষে, যুক্ত যা করেছে সে প্রতিবেশে, কখনো হয় নি তার মাপজোক ঢাকে-ঢোলে, পাতায় ফুলে ও ফলে, কাণ্ডে ও মূলে ছাড়া

যে পাখি এসেছে যখন, ফেরায় নি কাউকে কখনো, ঢেরগান প্রযোজিত পান্থপাদপে, নিহিত ভূগোলে, শ্যামে কী কৃষ্ণে নিজ কাণ্ডকলাপে

ছায়ার মায়ায় বেঁধেছে সে বহুজনে, টেনেছে দূরের পাখি, ফড়িং ও মৌমাছি দারুবনতটে

একটা ফুল তার ছুড়েছে কামনাধনুকে তীর
একটা ফল তার ডেকেছে মৃত্যুকে বাড়িতে
একটা পাতা তার গেছে কুঞ্জটিকার দিকে
একটা কাণ্ড তার এনেছে সত্যের মহামারি
একটা মূল তার দিয়েছে ভূকম্পনের ভীতি

মাত্র এ পঞ্চদোষে পাড়া-প্রতিবেশী যত মরু ও জলাশয়, পথ ও টিলা-ট্যাঙ্গর, পাহাড় ও গাছপালা, ভূমি ও ঘরবাড়ি ঠুকেছে গাছের নামে পোক্ত নালিশ— সমাজ নেই এর, এরে একঘরে কর, ফুলে যৌনতা ও ফলে বিষ, পাতার রেখায় এর পাপ লেখা আছে, কাণ্ডে মিথ্যা ও মূলে এর বিনাশমন্ত্র গাঁথা, এরে সমাজচ্যুত কর, কর সাষ্টাঙ্গে নির্মূল

ঘোর বৃষ্টিকে ডেকে আনা হয়— গাছ তেমনি থাকে
আসে অগ্নিরোদ— গাছ যেমন তেমন
বজ্র আসে— কিছুই হয় না গাছের

ক্রমে করাতি প্রস্তুত, ক্রমে পাকানো হয় রশি, সাজ সাজ রব পড়ে পাড়ায়, হৈচৈ-এ জেগে ওঠে জলমীনতক, রাত না ফুরাতে

ভোরে, প্রান্তরে ভেঙে পড়ে পাড়া, পাড়ার গড় চোখ দেখে যে গাছটি আপনা থেকেই নুয়েছে ভূতলে, মানে সে বরণ করেছে ইচ্ছামৃত্যুরে, ফলে হতাশায় জনতা নির্বাক, ফলে বেদনায় বিমূঢ় আক্রোশ

অথচ জনরোষ চেয়েছে দিতে গাছটিকে উচিত শিক্ষা, চেয়েছে তড়িঘড়ি তজ্জাত রোষের দমন

অতৃপ্ত জনরোষমালা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি শেষে হানতে আরম্ভ করে নিজেরা নিজেকে, এ ওর কণ্ঠায় বসায় মারণ কামড় তো ও মটকে দেয় এর নিশপিশে হাত

গাণ্ডীব

আত্মপক্ষ সমর্থনের মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ থাকাটাই স্ব-মূল্যায়নের সবচে' বড়ো সীমাবদ্ধতা

বয়সানুপাতে এক্সপোজড কাজবাজ এত কম কেন ? এ কথা ভাবতে গেলেই বাইশ সংখ্যাটা খুব মনে পড়ে, আসলে একুশ, লোকজন কেন যে একুশ-আঙুলেদের মিছে বাইশ-আঙুলে বলে ডাকে, আগে কখনো তা ভেবেও দেখি নি, বলতেন তিনি, শুয়ে কখনো অঙ্ক কষবি না দোহাই, অথচ তাঁর প্রিয় ছাত্রদের একজন হয়েও, শুয়ে শুয়ে ভেবে, তুচ্ছ এ কবিজীবনের আমি, ১১টা ৫৮ প্রায় বাজিয়ে ফেলেছি, এবার আমার, কী বলো, নিশ্চয়ই ফেরা দরকার কোনো টেবিলের দিকে

'বয়স কেবল সময় দিয়েই বাড়ে'— এরকম এক বিকলাঙ্গ সত্যের সাথে আমরা বিনাবাক্যব্যয়ে বহুদিন সংসার করে যাচ্ছি, এবার ওকে জানান দেয়া দরকার যে ভ্যালিড আরো ফ্যাক্টর আছে, বয়স কত হলে এক্সপোজার কত চাই, এরও অবশ্য কোনো মানদণ্ড নেই, সর্বজনগ্রাহ্য, নানা মত ও ভাবকে আমলে নিয়ে আমরা গণতন্ত্রের ঢেকুর সামলাতে ভিতর দিক থেকে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে শিল্পসুনাম প্রযোজিত মানুষ এবং মানুষ প্রযোজিত শিল্পসুনামের মধ্যে কোনটি বেশি অর্থবহ শিল্পীর জীবনে, মত স্থির করতে করতে সে সিদ্ধান্তে, বেলা বেশ বেড়ে যায়

ভাষাটাই বড়ো ব্যর্থতা ব্যর্থ লেখকের, সব বলবার কথা ধরা দেয় না সব ভাষায়, এ কথা যে যত আগে বোঝে, সে তত পথ হাঁটে দাপটের সাথে, বেশি মশলায় কষানো অখাদ্যের সামনে একবারও পড়ে নি, এমন মানুষের সাথে আমার মোলাকাত এখনো বাকিই রয়ে গেল, আভরণের অতি ঘটা নারীকে প্রায়ই খুব কৃত্রিম ও অসুন্দর করে তোলে, কবিতাকেও, জনৈক নারী-কলিগের বিয়ের দাওয়াতে গিয়ে একবার ঢুকে পড়েছিলাম আমি ভুল কমিউনে, উদ্ভট সব সাজগোজের ভিতর থেকে ওকে খুঁজে-পেতে শেষে একটি রোস্টাহারের সময়ও আর বাঁচাতে পারি নি, আমাদের মধ্যে যারা ভেবেছে যে এক কলমে সারাজীবন লিখে যাবে, তাদের সঙ্গে মদীয় অভিজ্ঞতার খুব একটা মিল নেই, কলমকে প্রায়শই বদলানো লাগে, ভিন্ন শৈলীর দিকে মুখ করা, তাইজন্যে চমৎকার দেখতে এক কলমদানিও লাগে, অসংখ্য অপশনের একটি প্রতীকী উৎসরূপে

আমার লেখার ইচ্ছেগুলো, জানাবোঝার ইচ্ছের কাছে হারতে হারতে, মাঝে মাঝে সশব্দে দাঁত কিড়মিড় করে, বুঝেও সব আমি বলি না কিছুই, জানি যে কাউকে

ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়া তার অধিকারে বাঁ'হাত, দেখার ইচ্ছেটা যেদিন হাঁসফাঁস করবে ক্লান্তিতে, কব্জিতে জোর থাকলে সেদিন, লেখার ইচ্ছেটা করতে পারে যা খুশি তাই, দু'য়ে মিলে এক হয়ে থাকাটাই সঙ্গত, এটাও এক দাম্পত্য ধরন, তবে প্রচলিত জায়া-পতি ধারণা এখানে নেই, একের খবর অন্যে নেয়া জরুরি খুব, বাট ডমিনেশন নট এলাউড, গৃহ-সহিংসতার কোনো বালাই নেই, একত্রবাস ফুটফুটে সব পোলাপান দেয়, দেয়ও না কখনো, এক বা দু'পক্ষেরই যদি সমস্যা থাকে, নিষেকোচিত

ফের যেদিন শুরু করলাম, সেটা বহুদিন পরে ভিতরের টানে, বাইরের চাপ ছিল বদার করি নি, যেসব বন্ধু ব্রাহ্মণের পৈতা পরে বাঁশের মাচাঙে বসে গ্রহদের উত্থান-পতন দেখছে খালিচোখে এবং যেসব বন্ধু খ্যাতির দুয়ারে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিতে দিতে একটা তীর্যক দৃষ্টি রাখছে লুপ্তপ্রায় বিরল প্রাণীদের ওপর, তাদের কারোর সাথেই আমার প্রতিযোগিতায় যাবার ইচ্ছে নেই, দরকারও নেই, কেউ কেউ ভাবে, পথ একটাই ওপরে ওঠার, স্বর্গে যাবার তারা একটা মার্গই মাত্র চেনে, অথচ জানা কথা যে অজস্র পথ আছে নানাদিকে ছড়ানো ছিটানো, 'ভিন্নপথে যাত্রা করে শাস্ত্র মেলে একস্থান', এইকথা বাংলার লোকধর্মও বলে, অবশ্য পতনের পথ একটাই, নিষিদ্ধ ফলভক্ষণ, বর্ণে-গন্ধে লোভনীয় সে ফলের দিকে রসনাপূজারীদের বেপরোয়া গতিবিধি দেখে, সঙ্গত হাসিটা থামাতে আমি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে থাকি, অস্পৃশ্যতাবাদী ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাবান লোভীদের সাথে একত্রে পথচলা বড়ো ঝামেলার, এদের একদল মাথার ওপর দিয়ে চিল উড়ে গেলে ভাবে জঙ্গিবিমান, আরেকদল শূকরের মতো নাক ডুবিয়ে ড্রেন থেকে উঠিয়ে আনে বর্জ্যবাহার, এদের কারোর সাথেই, জেনেশুনে, চা-পানকালীন খণ্ড কোনো বচসায়ও আমি আর রাজি নই, ওরা ওদের মতো থাকুক, একটা পিঁপড়েও কেননা সমান দরকারি এই ইকোসিস্টেমে

'যাহা সত্য, তাহা সুন্দর, তারেই বাসো ভালো', এই মন্ত্র আমি বরাবরই জানি, তবে মঞ্চে চরিত্রমুখে বিশেষ পরিবেশে এ কথা শুনলে পরে নারী হলেও তাকে 'প্রেরিত পুরুষ' বলে মনে হয় আমার, সমাজেতিহাস বিষয়ে যৎপরোনাস্তি জানাশোনা, 'প্রেরিত নারী'র স্থলে 'প্রেরিত পুরুষ'-বন্ধটিই এখানে অনুমোদন করে কিঞ্চিৎ সমালোচনাসহ, বন্ধটি হরিচরণে নেই, কোনো পয়দাদেশই কেননা বর্ণিত নয় নারী পয়গম্বরের মুখে, ঈশ্বরও অঙ্কিত নানা পুরুষের রূপে, যেহেতু ধর্মপুরাণ বড়োবেশি পুরুষতান্ত্রিক; তবে কথা সেখানে নয়, আমি 'বিনোদিনী' দেখতে গেছি

মানে কিন্তু নয় শুধু নটী বিনোদিনী, আমার কলাবেচার অধিকারের প্রতি করা উপেক্ষাপ্রয়াসটুকু মনে থেকে যাবে, গিফট মানে শুধু শুধু বস্তুভাবই নয়, বিনা মনোত্তাপে ওটা বোরো ধানের চিটা

মাসোহারা একটা বাতিঘর, কর্মজীবীদের, ওদিকে তাকিয়ে সংসার সমুদ্রে ভাসা নাবিকেরা, বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে ভি চলে, দায় ও মাল কীভাবে খালাস হবে তার নকশাপত্র আঁকে, আমার মতোদের ঠিক মাঠে মারা যেতে হবে, হঠাৎ সুনামি এসে ভেঙে গেলে বাতিঘর, ঘটিবাটি নিয়ে ঠিক ভেসে যেতে হবে, ভাসাটা চিরকালই মজাদার বটে, ভয় যত মোহনার পাকচক্রটিকে, যে দায়গুলো আমার পড়ে আছে নিজের ও অন্যের কাছে, সেসবের প্রেক্ষিত মনে এলে হঠাৎই নিজেকে খুব হিজড়া হিজড়া লাগে, ভাবি যে যতদূর নাগাল মেলে ওইদিকে, ততবড়ো ক্রসচিহ্ন এঁকে এক, চোখ দু'টো মুদে রাখি চুপে, কিন্তু 'অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না' মনে হয়ে যাওয়ায়, ক্রসচিহ্নজনিত ডিজেস্টারের থেকে এ যাত্রা প্রাণে রক্ষা পাই, এসব হলো গিয়ে লোকশিক্ষা, প্রয়োজনীয় খুব, তৃতীয় শ্রেণির অঙ্ক শিক্ষকের মতো, রামধনু দেখে বেড়াবার বেলায়ও, বিকেলে, আঙিনায় পেয়ে বলে বসে, হারে, তেরর কোঠার নামতাটা শিখেছিস বাছা! স্থানকালপাত্র সম্পর্কিত সাপেক্ষ জ্ঞানে খানিকটা ঘাটতি আছে মনে হলেও, লোকশিক্ষা প্রায়শই কাজে দেয়, ইনস্ট্যান্ট

সবাই ঘুমিয়ে গেলে রাতে আমি আনন্দে জাগি, লিখিপড়ি, পেছনে বাজতে থাকে মৃদুসুর, ভোরকোমলা, ফিল্মে বুঁদ হয়ে থাকি, কখনো বা বন্ধুদের কল দেই, এ আনন্দের হাত-পা কেমন যারা বুঝতে পারে, তাদের সংখ্যা দেখি ক্রমশই বাড়ছে, অথচ আমার ডি-জুস প্যাকেজ নেই, দুরু দুরু বুকে তাই কনভারসেসন পিছলে যায় রঙ ইন্টারপ্রিটেশনের দিকে, গাঁটের পয়সা খুইয়ে যেদিকে যাওয়া একেবারে অর্থহীন, মনোমতো প্রতিমা নেই, নতুন ছবিটবি খেলে না সে তীর্থে, জাগে না ছবিকল্পও, ঘুমার্দ্র যারা স্কুল ছেড়ে গেছে, কণ্ঠে ক্লান্তিভার, তাদের মায়া কাটিয়ে উঠি ডিফেন্সি বাঁশিতে, অন্ধকারকে ওরা থরথর কাঁপিয়ে দেয়, মনে হয় সবাই কখনো যায় না ছেড়ে চলে, হাইবারনেশন থেকে জেগে উঠে কেউ কেউ খোঁজ নেয়, খবরও তো, কাচ্চাবাচ্চা হলো কি না কোনো, কিংবা, এবারে ওইদিকে এডিসের ধারাওড়া কেমন, পাঁচতলায় খুব একটা মশা নেই বলে আমরা শঙ্কামুক্ত বেশ, আনন্দিতও, তবু এডিস কী এডিস নয়, তা আমরা কেমনে বুঝব গো, যদি দুয়েকটা থাকেও, নিরাপদে থাকতে আমরা লেবু বা বেলির টবে খুব একটা জমতে

দেই না পানি, ডেঙ্গু কী ভয়ানক চিজ সেটা সুচাঘাত খেতে খেতে বছর চারেক থেকে খানিকটা বুঝি, ওটারই এক স্বচ্ছ স্মারক, তুমি তো জান, বহন করছি আজো বেদনাভিঘাতী

ভররাতে সহসা ফুরালে সিগারেট, তড়িঘড়ি ছাদে যাই, গিয়ে হাতেকলমে, আসলে চোখেকানে, আমাকে বোঝাই যে মুদি দোকানগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে আজকের মতো, রাস্তাঘাট অন্ধকার, পাঁচতলা থেকে নামাওঠার শব্দে এখন, গোটাবাড়ি, বালিশ থেকে মাথা তুলে খরগোশের মতো উৎকর্ণ হয়ে যাবে, তাতে মন বুঝ মানে, মনে মনে মনকলা খেতে মন রাজি হয়, খুশি হয়ে ওকে আমি নিয়ে আসি ঘরে, ফ্রিজ খুলে বলি, পানি ঢালো যত পার গলায়, বস্তু বদলে হয় মানুষ বদল, কিন্তু তোমার মনের বদল আমি কিছুতে পারি নি ঘটাতে বন্ধু, আমাকে যদি একদলা বস্তুই ভাবো, আমার বদলে তবে মনের বদল তোমার হতে পারে ভাবি, এটি হলে মনে হয় নানাদিকে এই আমার এক্সপোজার বেড়ে যাবে আরো

লিখতে শুরু করবার প্রস্তুতিপর্ব

শুধু তো ছিঁড়বে বল, কী বাল ছিঁড়বে তুমি ছিঁড়েই দেখাও, লিখ বূঢ় অ্যান্টিক অথবা আলোকপুচ্ছ, বীরোচিত জেগেছিল আকাশতল্লাটে যেই সৌর-রহস্য, কিংবা লিখ গানাবেশ, অননুমোদিতেসু মৌসুমী ধারা, বুড্ডিস্ট চান্টস, দুপুরের বটগাছ আর তার ঝুরি, উইন্ডজুড়ে ভেসে আসা চৌরাশিয়াফুল, আমরা দেখেছি কত লালনের সুরমগ্ন ঘাটে-নেমে-জলখাওয়া সাধুসন্ত লোপ, ধানের খেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোদেদের গলা কেটে নদীজল লাল করে দেয়া, এসব তো লিখতে পার— কষ্টকল্পনার শিল্পক্ষতি, ভ্রমণের মধু ভ্রমণের বিষ, পুড়িয়ে-পিটিয়ে হত্যা, আমাকে আর ছোঁবে-না নির্দেশ, চাপাতির কোপ, গুলেলায়লা আতরের ঘ্রাণ, তালেবানি বিপ্লব আর গেলাসে গেলাসে উপচে ওঠা ভেট সিক্সটিনাইন, লিখ শনির আখড়া পাড়ায় আরেকটা কানসাটের জেগে ওঠা, লিখ ধর্ষিত রাজনীতি ও রাজার নীতিতে ফলা উফশী মিথ্যার দাহে দেশজুড়ে নেমে আসা মনন-কলুষ, নগরবেশ্যার উৎকট সাজ কিংবা রাজাকারতন্ত্রপুরে বিটের তালে তালে গণধর্ষণ খেলার কথাও চাইলে লিখা যেতে পারে

কী লিখতে চাও কিছুই বল না যদি মোড়ের মস্তান লিখ, লিখ র‍্যাব-কোবরা-চিতা কিংবা পাষণ্ড পুলিশ, ফিকশনের নতুন আঙ্গিক ক্রসফায়ার নিয়ে লিখ, লিখ অকার্যকর সংসদ, মিডিয়া বুজরুকি, সাম্রাজ্যবাদের দালালি করে টাকা করা, লিখ সংলাপ নামের ছিলা কলা, গাড়িহীন রাজপথে হরতালের সাফল্য-আফল্য গোনা, কুটিরশিল্পের ব্যাপক উন্নতি আর যখন যেখানে খুশি সিরিজ বোমার খেল, ঢলাঢলি ঢেলাঢেলি করে সঙ্গীকে ল্যাং মারা, লিখ কামে-প্রেমে দ্বন্দ্ব নিরসনে ট্রাক ট্রাক এ.কে-ফরটিসেভেন, পেটেন্ট কারণে লিখ বীজাভাবে ভুখা সব কৃষকের চোখে নামা জলকথা, চুরমার এথনোবোটানি আর এলিয়েন স্পিসিসের মনোকালচার, গরুদের পেটেচোখে মায়া, জিএমও'র রামচোদন আজ দেশে দেশে, মানুষ মেরে লিখ কী করে রক্ষিতে হয় বায়োডাইভারসিটি, সেবাবাণিজ্য লিখ ওতপাতা বহুজাতিকের নখদন্তহাতে, ইকোলজের দিকে চুলওড়া রভসে তবু বউ নিয়ে ঘন্টায় আশি কিলো রান, হেলমেটে তাড়া খাওয়া বাতাসের দৌড়ের ধ্বনি, যেন শ্মশানে মাথার খুলি শরৎবাবুর দেখা, হরষে এগিয়ে যাও সন্ধ্যা হয়-হয় সময়ের ঠাণ্ডা-লাল সূর্যকুসুমের পেট থেকে নেমে আসা কবিতার উটকো চরণ তুমি ধরে বস

লিখবে কি গাঁজার ঠেক নাকি কমে আসা পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস, আধপোড়া মোমের দানিতে সিংহচিহ্নিত কোনো আসন বানাতে সিংহীর দু'চারিটি কেশের স্খলন, যুক্তির লাশে চড়ে ঠোঁটেমুখে চোপা লিখ, হেলমেট হোন্ডারে ঝোলা দিনকার কাঁচাহাট ছোটমাছ, আগুন লাগানো দামে আলুপটলটমেটোসজনেলাউ, জোটের চোটে পকেটের তলাঅব্দি টান, 'ভাইসব, আমরা এনেছি দেশে লাখো লাখো কুমিরের ছানা, কেটে শুকনো শত খাল', প্রতিদিন দেহের ছাল বাকল ছিঁড়ে একনম্বর গিয়ারে তবু ঘরে ফেরা, পরাজিতের, ঘরের বাইরে কোনো ফুটপাতে সদা মুখ ভার করা নিত্যব্যর্থ ত্যাগী মন, নমিত-দমিত

কী লিখতে চাও, লিখতে কী সাহসই বা কর, কিছুই তো লিখা হয় নি তোমার, যা খুশি লিখতে পার, যেকোনো কিছুতে আজ যেকোনো কিছুটিই লিখা যেতে পারে, পালাতেই চাও যদি পাঁচদিন আগে দেখা লিখ তবে স্বপ্নের স্কেলেটনখানি

পাঁচদিন আগে দেখা স্বপ্ন

যেকোনো পোর্টে থামে ও চালককে বলে হিসি-দিতে-যাওয়া-যায় জাতীয় বিমানে করে উঁচু এক টিলাতে সেদিন ডজনতিরেক বালবাচ্চা নিয়ে মহাবিপদেই পড়া, বাচ্চালোগ পাইলটকে না-বলে খোদ আমাকে বলে-কয়ে গুলতি মারতে গেছিল কোন ফাঁকে, উঠতি বয়েসি এক প্রজাপতির হেটলাইটের আলোয় ঝলসে গিয়ে আমি তথ্যটা চালককে দিতে ভুলে যাই, শেষে খটরমটর করে বিমানটি শুরু করলে ওড়া, স্রেফ মানরক্ষার তাগিদে চালকব্যাটার হাতে-পায়ে ধরে আরেকটু ল্যান্ড করাতে রাজি করানো ও বালবাচ্চাদের যাহোক একটা হিল্লা করা, বিমানের আর সব যাত্রীরা ওই ভুলের দণ্ডস্বরূপ টলারেটই করল না আমাকে, ডজনের সবাইকে উঠিয়ে শুধু টিলার ওপরে একা আমাকেই রেখে গেল ফেলে

শেষে মনমরা হয়ে নিশিন্দা গাছের ছায়া ধরে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে কামারবাড়ির কালীকৃষ্ণ বালিকার সাথে দেখা, দু'হাতে বুক চেপে অপমানকর এক কথা বলে পাশবাড়ির দেওড়িপথে সে অন্তর্হিত হলে চোখ গিয়ে থেমে যায় পুকুরের ধারে, দেখি লাল মোরগরঙা ধার দেয়া বাইকখানা আমার ভেঙেচুরে পড়ে আছে দালানও'লা বাড়িটির পিছে, কাঁদো কাঁদো মনের বেদনে আমি ঘাসে বসে পড়ি, চুল ছিঁড়ি টেনে টেনে মাথার, ভাবি, আমার জনম গেল হারাতে হারাতে— এসব ঘটনা নিয়ে একদিন দু'চার কথা লিখতে হবে জানলে, পকেটের নোটবইয়ে স্বপ্নবৃত্তান্তের সব অনুঘটনাও জেনো টুকে রাখতাম ঠিক গল্পকারের মতো

গল্পকার যেভাবে টুকরো ইনফরমেশনগুলো টুকে রাখেন তাঁর খাতায়

সাহায্য সংস্থার ডায়েরিতে কালো কালিতে চিকন হরফে, কখনো বাংলায় কখনো ইংরেজিতে, কখনোবা রেখায়-আঁচড়ে, সুগন্ধা নদীর বাঁক কোনমুখী, হুলারহাটগামী লঞ্চের দৈর্ঘ্য, সন্ধ্যা ও দোয়ারিকা ফেরিঘাটে পাটাতন কত— পাতায় পাতায় এতসব বিচিত্র ফুল ফল এঁকে খানিক থেমে তিনি জানালায় তাকান, হেলান দেন চেয়ার কোচের গদিতে, হাঁটুর উপরে ভাঁজ হয়ে ঝিমুতে থাকে নীলাশীষ মাখা তথ্যভারী খাতা, বাতাসের চাবুক খেয়ে চমকে উঠে সহসা লেখেন ভাঙাব্রিজ, দৌলতদিয়া ফেরিঘাট, তুরপুন মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল, লেখেন ইয়েলো ড্রাগনফ্লাই, উর্বরা আলুর আড়ৎ, এমএল অনন্ত, যেটা আটকে গেছে বালুচরে, আর জল আর সমুদ্দুর, সব, গল্পকার যেভাবে এঁকে রাখেন তার নকশাবিদ্যা দিয়ে, আমি সেভাবে জেনো কোনোদিন ধরে রাখব সবটুকু আমার চোখের জল

আমার চোখের জল

কাঁদি না বলে-কাঁচা দুঃখগুলো ভিতরের অদৃশ্য আধারে ধরা থাকে, এই 'কাঁদি না বলে সব ধরা থাকে' জাতীয় অহংকারটা মিথ্যা রাজহাঁসের মতো, যেটা হঠাৎ ঋ লিখতে গিয়ে ফুটে ওঠে কাগজে, কখনো না-কাঁদা খুব ক্ষতিকর, বাবা মরে গেলে আমরা কাঁদি, মা মরে গেলে, ভাইবোন-আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী মরে গেলে কিংবা স্বামী, এসব মরামরি কাণ্ড দিনান্তে ঘটে না কারো, এগুলো ছাড়াও গোপনে একা একা কাঁদা ভালো, প্রায় নিয়মিত প্রত্যেকেরই কাঁদবার মতো কিছু ঘনঘটা থেকে যায়, থাকে, গোপনে ভাবলে ঠিক পাওয়া যাবে, অবশ্য বেহায়া-নিলাজের বেলা নাও থেকে পারে, দেখো, গোপনে আমি কাল কাঁদব একাকী, অশ্রু ঝরবে যেসব পবিত্রতর, শক্তিবলে জমিয়ে সেসব শক্ত করে রেখে দেব যত্নে আদরে, আমার নিজের তো কাঁদবার মেলা ইস্যু আছে, যেসব নিয়ে এমনকি একাধটা কবিতাও লিখা যেতে পারে, ভিতরের কবিজনে দেখব বলে কয়ে, এসব ভাঙন নিয়ে যখন যেমন পারে সে যেন দু'দশ কথা লিখে-টিখে রাখে

শক্ত হয়ে ওঠা চোখের একটি জল নিয়ে কবিতা

পা ফেলতেই সাপের বাহার তিড়িং বিড়িং ফণা, পা ফেলতেই নিরানন্দ চেনা জীবনযাপন, পা ফেলতেই ঘোর দংশন, নষ্ট গাজন, পা ফেলতেই ব্যাহত হয় নিজের মতো চলা, পা ফেলতেই পকেটকাটা স্বাস্থ্যহানি, পা ফেলতেই বেজার বন্ধুর লম্বাটে পা, দৌড়ানো বা, হাজার একটা পায়ের সাথে ঠোকাঠুকি, পা

ফেলতেই পায়ের গায়ে দগদগে ক্ষত একটি জেগে ওঠা

জেগে ওঠা

ফের যখন জাগব তখন রোদ এসে বিছিয়ে রেখেছে দেখব চাদর, আমি তার ওপর দি' হেঁটে হাত মুখ ধুতে যাব, বাথরুম সারব, ধূলাবালি ঝাড়ব ও বাইরে বেরুব, যখন ফিরে আসব তখন জেগে ওঠাটা কীরকম ফলপ্রসূ হলো, তার হিসেব মেলাতে কাগজে এক আঁকব জ্যামিতি আর তার ওপর ফাঁদব একা দুনিয়া কাঁপানো সেই উপপাদ্যখানি, যা কখনো পারেন নি ইউক্লিড কিংবা শিমজাতীয় শস্যবিদ্বেষী পিথাগোরিয়ান কোনো বুড়ো

পিথাগোরিয়ান শিমবিদ্বেষ

কেন এ নিষেধ পিথু, অযথা ভজনশালার গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছ কেন লাল কৌপীনখানি, যদি রেশমের মতো ঠিক টান দিলে নাই-ই খোলে সূতা, তবে এ বন্দিদশা চল ভেঙে ফেলি, চল ঘরের বাইরে যাই, গিয়ে দেখি তুঁতপাতা গুটিপোকার খাদ্য হওয়া ছাড়া লাগে কি না দরকারি আরো কোনো কাজে

ময়মনসিংহ জং

প্রথম দৃষ্টিলগ্নে কারো কোনদিকে তাকাতে হয়— চোখের, মুখের নাকি অন্য কোনো উপাঙ্গের নৈবেদ্যে, কখনো জানে না সে, তাকানোর কাজবাজ কখনো কোনো ব্যাকরণের নিয়ম মেনে করা হয় নি তার, যখন যেভাবে থেকেছে, মন চেয়েছে যেভাবে, সেভাবে চেয়েই এ বড়ো জগৎসংসার চিনেছে-বুঝেছে, মনে রাখতে পারে নি কারো চেহারা, মানুষের মৌলদর্শন-গুণ কীসের মানদণ্ডে নির্ধারিত হয় জানে না তা, এমনিতেই যদি খাপে-খাপে মিলে যায় তো অদৃশ্যে ছাপ পড়ে, ভোলা যায় না

যে রাতে চন্দ্রালোক তার হাত ধরে কুয়াশার বেড়াজাল ভেদ করে প্রান্তরের পথ ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, সে চাঁদে আর এ চাঁদে বিস্তর ফারাক বলে মনে হয় তার, কখনো কোথাও কেউ দেখেছে কি না এরে বুঝতে পারে না, অন্তরাতে বাঁশবনে হেঁটে হেঁটে আলোর শয্যায় তার মনে হয়, এ বুঝি সবচে' নতুন, একে আর দেখে নি কোথাও, সে অথবা অন্য কেউ

একবার হিয়া-পিয়া-রিয়াকে প্রথমা-দ্বিতীয়া-তৃতীয়া ভেবে রচা হয়ে গিয়েছিল অসম্ভব এক স্বপ্নসেতু, মনে পড়ে তার, মানসিক সেই চাপেই হবে হয়ত, সহসাই দিয়ে বসে সাড়া বাঁকা দৃষ্টিডাকে, একবার মাত্র বলায় রাজি হওয়া ঠিক নয় কোনো কাজে, তবু কী যেন এক টানে লাজ ভুলে সে পৌঁছে গিয়ে জ্যামে, হন্যে হয়ে খোঁজে, কিন্তু না, কোথাও কেউ নেই, সবাইকে মনে রাখতে যে পারে না সে, তখন তা বোঝা যায়, বস্তুতই সবস্থানে তাকানো হয় নি ওদের, অথচ যতদূর মনে আসে, আবেগে ঝরঝর হয়ে সবগুলো সত্যডিম ফাটিয়ে দিয়েছিল নিজস্ব উমে, সে হেন কান্নামালা হাহাকার হয়ে অলিতে গলিতে বাজে মনের, আরেকটু ভিতরে যাবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা-আকুলতার তবু শেষ নেই মানুষের

ওটা ছিল নিতান্তই এক সহজ সমর্পণ, বুঝতে পারে সে, আবেগ তখন উছলে উঠেছিল দিগ্বিদিকে, তার তখন মূর্ছা যাবার দশা, জগৎ বদলে যায় যেন, দিব্যি চলাফেরায় এ তার অন্যরকম এক মূর্ছানুভূতি, সবাই যেরকম পারে না, পারে কেউ কেউ, কিন্তু কী নির্মম যে ওই প্রাণকে আরেকদিন সে না-ও চিনতে পারে, ভিড়ের হৃদয়ে বেশ লজ্জার সঞ্চার হবে যদি নাই-ই ঠিক চিনতে পারে, ভাবে সে

চোখজোড়া নাকি জগৎ মাতারি তার, ফস্কায় না কোনো খণ্ড সুন্দরও, লোকমুখে এসব রটে যাবার পর কার্যত যার-তার-দিকে আর ঠিক চোখে তাকানোই হয় নি, সত্যিই যদি কেউ বাণে পড়ে বসে, কী করে সামলাবে সব, শেষমেষ দুর্বল স্বপ্নে সবকিছু জানতে-বুঝতে নিজে হয়ে ওঠে অবদমনজনিত এক পর্বতারোহী, সে তখন এত উঁচুতে যে সবাই একসময় ফিরে যায়, এমনকি দেখে বহুবল্লভারাও পশ্চাদ্দেশ দেখাতে শুরু করেছে, শেষে জানা কথা ওরাও ফেরাবে তাকে

কল্পনার মতো সত্য এ ব্যাকুল রাতে সে কি তবে আরেকবার পথে বেরুবে কুয়াশার মাথাল পরে, প্রান্তরে কড়ুই পাতার মতো ছ'ড়ে থাকা গানগুলো কুড়িয়ে বাড়িয়ে কি আরো কিছু বাগান সাজাবে, এসব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জবাব খুঁজে পাচ্ছে না যখন, তখন সামনে এসে দাঁড়ায় রাগান্বিত লালচোখ কৃষ্ণাঙ্গ চন্দ্রমুখী, ছাদের নিচে ভৌতিক স্বর তার, বলে— 'আমাকে তুমি চেন না!', আকস্মিকতায় কুঁকড়ে গেল সে, ফচকে গেল, চিনবে কী, তার চোখের দিকে তাকাতেই পারে না, তাকাতেই পারে না

গাণ্ডীব

লতা বাওয়ার কাজবাজ প্রায়শই জাদু বাস্তবিক হয়ে যেতে চায়

'ম্যাজিক রিয়ালিজম, ও হ্যাঁ, বাংলায় যাকে বলে জাদু বাস্তবতা, এটি হলো কল্পগল্পকে সত্যস্বত্বের পোশাক পরানো, সত্যের মতো দেখতে-শুনতে সত্যোপম সব আখ্যান বানানো। জানো, নামবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেন জার্মান শিল্প সমালোচক ফ্রাঙ্ক রোহ, উনিশ শ' বিশ-এ। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে আছে ও ছিল, ছিল অন্য বহু স্থানে এবং কালেও। আলেহো কার্পেন্তিয়ার— কিউবার, চল্লিশে জানান দেন যে, অধিকাংশ লাতিন আমেরিকান সাহিত্যেরই এটি মৌলিক চারিত্র্য।' ছোট্ট একটা আড়মোড়া ভেঙে ও বলে, 'কলাম্বিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও চিলির ফিকশনে ওটার ঠাসবুনোট লক্ষণীয়, চাও তো বলতে পার, মাখামাখি।'

টিভিতে তখন মূর্ছিত সেতার

'তোমার জানা আছে যে, ম্যাজিক রিয়ালিজম কোনো শিল্পান্দোলন বা দর্শন নয়, একটা অ্যাখ্যান-ঘরানা মাত্র। মার্কোয়েজ, আমাদো, বোর্হেস, কার্তেজার, আলেন্দে... (এরপরই নিজের নাম বলতে ইচ্ছে করে পাখিটার) ম্যাজিক রিয়ালিজমের একেকজন মহান স্রষ্টা'। একটু পাখা ঝাপটিয়ে বলে যে, 'মার্কোয়েজ বিশ শতকের অমর সাহিত্যস্রষ্টাদের একজন। মিস্ত্রাল, নেরুদা, আস্তুরিয়াস ও বোর্হেসের পর তিনি চতুর্থ লাতিন আমেরিকান শিল্পতারকা।'

স্বকণ্ঠনিঃসৃত 'মাখামাখি' শব্দটা তিতলি পাখির মাথা থেকে কিছুতেই সরছে না, যদিও পরে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। শব্দটির গন্ধে আনমনা হয়ে যায় ও, উড়ে এসে লতার নিকট জুড়ে বসে, নড়ে ওঠে তরু বল্লরী বীথি। অবসন্ন দেখায় পাখিটাকে। বলে, 'শোনো, মার্কোয়েজের কারুগদ্যের মডেল ছিলেন দু'জন— ফকনার ও হেমিংওয়ে, উত্তর আমেরিকান মহাজন।'

ইত্যবসরে তিতলি পাখির ভিতরে কিছু একটা বদল ঘটে গেছে, তার হয়ত কোনো প্রকাশও ছিল, টের পেয়ে যায় লতা। সহজাত আগ্রহ জাগে তার মধ্যে, দেখে, পাখির চোখ চকচক করে উঠছে। নেতিয়ে পড়ে ও আরো। এক ফোঁটা কুয়াশার ভারও যেন আর বইতে পারছে না, এমন লাগে ওকে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিতান্ত অনিচ্ছা থেকে ও বলে, 'মার্কোয়েজ বলেন...'

তবলায় তিন তাল, জাকির হোসেন

পাখিটা হঠাৎই চরকি ওড়া দিয়ে এসে আরোহণ করতে থাকে পাতা থেকে পাতায়। তারপর একইভাবে অবরোহণ। লতার আঁকশিতে আটকে থাকে খানিক। ঠিক পরের বোলে ফ্রি। কিন্তু মার্কোয়েজের কোন কথাটি বলতে চেয়েছিল, তার কিছুই আর বলে না ও। লতার পক্ষে জানার ইচ্ছেও তখন মৃতপ্রায়।

পাখিটিকে বেশ পটিয়স লাগে, তেতালে যদিও আগে লতা বায় নি ও। রঙেরূপে অনাকর্ষণীয় এবং গানবোবা বলে কখনো কেউ ফিরে তাকায় নি ওর দিকে। সে আরো দ্রুত হয় ও ঘন শ্বাস ফেলে। পথ ছেড়ে দিয়েছে লতার পাতা ও আঁকশিরা, ততক্ষণে। খেলাচ্ছলে আরেকটি ওড়া দিতে গিয়ে পাহাড়ি ল্যান্ডস্কেপে চোখ পড়ে ওর। দেখে স্বয়ংপ্রকাশিত দু' দু'টি চিনামাটি হিল, বিজয়পুরে। ক্রোকারিজ ব্যবসায়ীদের ইজারায় এখন। প্রতিদিনই ট্রাক ট্রাক সরে যাচ্ছে মাটি। সার সার কর্কট দাগ। নেমে এসে সহসাই ঠোঁট বসিয়ে দেয় একটি ফুলে। রস ফুরোলে অন্যে। এরই ঢালে কিয়দ্দুরে মরা সোমেশ্বরী। নিচে শুকনো খাদ। ওর এক কিনারে পৌঁছেই বিবর্তনের নিয়ম ভেঙে তিতলি পাখি সরীসৃপ হয়ে যায়। ঊষর প্রান্তর চষে ফেলে স্রোতস্বী ক্যানেলের খোঁজে। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা।

ডিসকভারিতে বিচ ডকুমেন্টারি, উঁচু ঢেউ আর সানবাথ

ম্যানগ্রোভ ফরেস্টে ও অস্বচ্ছন্দ, ক্রোশ কয় দূরের সাগরে আরো বেশি, তবু এগোয়। নিষ্কেশা সরীসৃপ সাগরসঙ্গমে অনভিজ্ঞ, আযৌবন ব্যাক পেইনের ভারে পীড়িত, চিররোগা। গায়ে বাতাস লাগলে কুঁচকে যায়, উড়তে পারে না ঝড়ের বিপরীতে। ফুঁ দিয়ে চা খায়, ফুঁ লাগলে ওড়ে যায় দূরে।

লতা ততক্ষণে কুয়াশাসিক্ত ছোট নদী, এই লতাই নাকি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মাসকাটা নাম ধরেছে, শোনা গল্প, তারপর ছোটবড়ো আরো নদী, এরওপরে পাতরার জঙ্গল, বালুঢাল ও মোহনা, বঙ্গোপসাগরের।

ঐশ্বর্য রাইয়ের ডলনাচ

রাইয়ের মুদ্রাবাহুল্যে ভরা নৃত্যপ্রয়াসটিও আগে মন দিয়ে দেখত পাখি, এবার তার অন্যথা হলো। নাচ ভুলে ও সমুদ্রমন্থন শুরু করে, মন্থন আর লেহন, লেহন আর মন্থন। ও খোঁজে অমৃত, পায় না। গরল ওঠে দ্বিতীয়বারেও, তৃতীয় চেষ্টার আগেই ওর শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়, সাগর মোহনায় তখন তরঙ্গিত শুধু ফেনা আর বালিজল।

মার্কোয়েজ মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে নোবেল জিতেছিলেন, আর লতা জিততে চায় অর্গাজম, জ্যেষ্ঠতার অধিকারে, ধৈর্যেরও ওটা দাবি। কিন্তু সফেন সমুদ্রের তুলনায় অত্তটুকুন সরীসৃপ, ভয়ে কুঁজো হয়ে যায়। অর্ধমুদিত চোখে বলে, 'আই কান্ট কিস, আই কান্ট মেক কমপ্লিট লাভ, আই...', শতবর্ষের নীরবতা নামে ওর অবয়বে।

মার্কোয়েজ স্বীকৃতির ভিতর দিয়ে মারা যান উনিশ শ' বিরাশিতে, সরীসৃপ বিনা স্বীকৃতিতে, ঠিক তার তেইশ বছর পরে, অ্যাডভেঞ্চারে।

লতা উলম্ব, লতা আনুভূমিক, লতা সূর্যমুখী, লতা বহমান। লতা স্পর্শ ও জ্ঞানকাতর, লতা প্রেমপ্রতারিত। লতা মা, লতা দিদি, লতা বন্ধু, লতা রতিতরঙ্গিনী। লতা পাতাদের ঝোপ, লতা রহস্যসরোবর। লতার ভিতরের ছন্দনাচ তার নিজের কাছেই ভীষণ অপমানকর লাগে তখন, এলিয়ে পড়ে' সে কাঁদতে থাকে। প্রশ্রয়টাকে, যা তার থেকেই উৎসারিত, অপরাধ বলে মনে হয়, অক্ষমার্হ এখন নিজের কাছে সে নিজে, পয়জন আইভি ভাবতে লাগে সে এবার নিজেকে।

লতা বিশ্বাস করে, ম্যাজিক রিয়ালিজম উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখাজোখার এক সহজাত উদ্ভাস, তাই মার্কোয়েজের জন্মকে সে নিতান্তই ঠাট্টা ভেবেছিল।

ব্যাস

নয়দিক ফাঁকা একটা ঘাসে-মোড়া মাঠ, তার ভিতরে বেশ কায়দা করে তাঁবু খাটানো, বিশালায়তনের তালব্য-শ বর্ণাকৃতির এই তাঁবুটির দু'টোমাত্র দরজা, 'শ' বর্ণের লিখনশৈলীর সূচনাবিন্দুতে একটি, অপরটি শেষমোড়ে, তাঁবুর প্রবেশ দরজায় মস্ত এক খুঁটির সাথে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ইউএন ড্রেসে কোফি আনান দাঁড়ানো, কালো মুখটা তার অপমানে আরো কালো, মুখের দিকে তীর আঁকা একটা স্টিকারে লেখা **অভাজনের যেকোনো গালে সজোরে একটা চড় কষে ভিতরে ঢুকুন**

বিনা টিকিটে উপভোগ্য এই লাইভ শো বা জান্তব প্রদর্শনী সম্পর্কে বিশেষ জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ভোর হতে-না-হতেই মাঠ লোকে লোকারণ্য, তবু কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, প্রদর্শনীতাঁবুয় দর্শনার্থীদের প্রবেশ সূচিত হলো সকাল আটটায়, প্রথমজন নির্দেশমতো আনানের কৃষ্ণাননে দশাসই একটা চড় কষে ঢুকে গেল ভিতরে, প্যাসেজের শেষবিন্দুতে অপরিশোধিত রেঁড়ির তেলভর্তি একটা মস্ত পিঁপে ও প্রমাণ সাইজের একটি ড্রপার লক্ষ করল সে, তার ওপরে সাঁটানো স্টিকারে লেখা ←**আমাদের দু'জনের পাছায় তেল দিন**→, সে দেখল 'শ'-এর দুই ভিন্ন গোলায়তনে পরস্পরের দিকে পিঠ করে দাঁড়ানো আছে বুশ ও ব্লেয়ার, দু'জনেরই হাত-পা বাঁধা, পোশাক-আশাক স্বাভাবিক, তবে দু'জনেরই পশ্চাদ্দেশ বাজার অর্থনীতির মতো মুক্ত, নির্দেশমতো ড্রপারে তেল নিয়ে লোকটা আধাআধি করে দু'জনের পাছায় লাগাল, বুশ বা ব্লেয়ার কারো মুখেই কোনো রা নেই, বিষণ্ন, তারপর **এদিকে যান**→ স্টিকার অনুসরণ করে এগিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে লম্বালম্বি প্যাসেজে পড়তেই সে দেখল পাঁচভাগে গোছানো যুদ্ধসমর্থক দেশসমূহের রঙচঙে মানচিত্র, প্রথমভাগে আমেরিকার প্রতি উৎকোচে কাত হওয়া দেশ আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, জর্জিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, চেক রিপাবলিক, স্লোভাকিয়া, কলাম্বিয়া, আলসালভেদর, নিকারাগুয়া, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, পোলান্ড, রুমানিয়া ও মেসিডোনিয়া, দ্বিতীয়ভাগে ধমকে জব্দ দেশ ডেনমার্ক, তৃতীয়ভাগে অন্ধ সমর্থক দেশ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ড ও আইসল্যান্ড, চতুর্থভাগে আমেরিকার সাথে খাতির থাকা ভালো— এই নীতির ধারক দেশ তুরস্ক ও হাঙ্গেরি

এবং পঞ্চমভাগে মুখে এক তো কর্মে আরেক— এই নীতির ভ্রাতৃঘাতী দেশ কাতার, কুয়েত, সৌদিআরব, মিসর, জর্ডান, বাহরাইন, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাছেই একটি বড় কালির পাত্র ও ব্রাশ রাখা এবং স্টিকারে লেখা ←**যে কয়টি মানচিত্রে ইচ্ছে কালি লেপে দিন**→, লোকটি সাবেক সোভিয়েটের অঙ্গরাজ্যগুলো বাদ দিয়ে সবগুলো মানচিত্রেই অল্প আঁচে কালি লাগাল, কিন্তু কোনো তালিকায়ই ইসরায়েলকে না পেয়ে নাখোশ হলো সে, মানচিত্রগুলোর শেষে একটা ছোট্ট টেবিলে মন্তব্য খাতা পেয়ে সে আয়োজকদের উদ্দেশে লিখল— আপনাদের অবশ্যই জানা থাকা দরকার যে, যুক্তরাষ্ট্রের টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা জেনে ইসরায়েল ইতোমধ্যে তাদের মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিজের তৈরি ইটাল্ড ডেকয় ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের চুক্তি করেছে, কাজেই সত্বর ইসরায়েলের মানচিত্রটিও এখানে সংযুক্ত করুন, বেরোতে গিয়ে লোকটি দেখল বাহির পথের একটি খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়ানো ভয়ানকরকম বিধ্বস্ত ও এলোমেলো সাদ্দাম, স্টিকারে লেখা ←**আমাকে চুমু কিংবা থুথু দিয়ে কেটে পড়ুন**, সাদ্দাম একনায়ক হলেও দেশপ্রেমিক, সে তার নাগরিকদের মাথাপিছু মাসিক মাত্র ১৩ টাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির রেশন খাওয়াত এবং পূর্বের দাপুটে সাদ্দাম মার্কিনি প্যাদানিতে অধুনা সাংঘাতিক কাবু ও নীরিহ, দেখে, লোকটি তাকে চুমুই দিল এবং একটা দারুণ মজার খেলা খেলে বেরোল এরকম একটা অভিব্যক্তি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল

শান্তিপূর্ণভাবে সারাদিনই প্রদর্শনীটি চলল, আশ্চর্যের ব্যাপার যে দর্শকদের প্রত্যেকেই হাসতে হাসতে বেরোল, তবে সাদ্দামের ক্ষেত্রে দর্শনার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করল, কেউ থুথু দিল তো কেউ চুমু, আবার কেউবা নির্দেশ অমান্য করে মাথার উঁকুন বেছে দিল কিংবা দিল চুমু-থুথু দু'টোই, লক্ষণীয় যে সকল দর্শনার্থীই সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনীস্থল ত্যাগ করল, বাংলাদেশে এরকম ঘটনা বিরল, এ দেশে অযথাই জটলা করে লোকে, কাজ শেষ হলেও যায় না, কিন্তু এ প্রদর্শনী থেকে লোক তাড়াতে র‍্যাব-পুলিশ-চৌকিদারের একদম দরকার হলো না, এমনিতেই সব ফকফকা, সকলেই নিয়ম-নীতি মানছিল, কারোর অধিকারেই কেউ বাঁ'হাত দিচ্ছিল না, কাজেই কোনো জ্যামও লাগছিল না কোথাও

সন্ধ্যার ঠিক প্রাকক্ষণে, ভিড় যখন অনেকটাই কম, তখন এল শেরোয়ানি ও কালো চশমাপরিহিত, আনাভিলম্বিত দাড়ি, দীর্ঘ ও সুদর্শন এক ঝোলাধারী পুরুষ, সম্ভবত

আয়োজনটা তার ভালো লেগে থাকবে, এজন্য সে মুচকি হাসল খানিক এবং কালবিলম্ব না করে প্রবেশপথের স্টিকার অনুসরণ করে হাতটা ঘুরিয়ে আজদাহা একটা চড় কষতেই আ.আ. করে আনান সাহেব ঘাড় ছেড়ে দিল, কেউ এই খুনের ঘটনাটা দেখে ফেলল কি না, পেছনে তাকিয়ে তা যাচাই করে কাউকে না পেয়ে সে বাঁ'হাতে চশমাটা খুলে ফেলল, অমনি চেনা গেল যে লোকটা আরবীয় বংশোদ্ভূত ওসামা বিন লাদেন, সে তারপর ঢুকে গেল ভিতরে, আড়াল পেয়ে এবার সে স্টিকার অনুসরণ না করে ঝোলা হাতড়ে বের করে আনল হাতদেড়েক দীর্ঘ মসৃণ দু'টি লাঠি এবং ইতোমধ্যে তেলাধিক্যে ফুল্ল বুশ-ব্লেয়ারের শ্বেতশুভ্র পাছাদ্বয়ে সপাৎ করে ঢুকিয়ে চালাল আচ্ছারকম ডালঘুঁটনি, এতে বু.বু.-বে.বে. শীৎকার করে দু'জনই একে একে পটল তুলল, লাদেন খুশিতে আটখানা হয়ে ডানে মোড় ঘুরে মানচিত্রের মজাদার আয়োজন দেখে খুবই পুলকিত বোধ করল এবং ব্রাশে বেশি করে কালি নিয়ে আফগানিস্তানের কেবল 'স্তান' বা 'স্থান' বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সবকটি মানচিত্রেরই অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিল, মন্তব্য খাতায় সে লিখল— **বেড়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছ বাহে, তোমাদের আল কায়েদার সভ্য করে নিলাম : বিন লাদেন**, এরপরে হাঁটল সে, এন্ডিংয়ে কাতর সাদ্দামকে দেখে লাদেন এমন আনন্দিত হলো যে নির্দেশমতো শুধু চুমু দিয়েই সে ক্ষান্ত হলো না, বাঁ'হাতে জাপটে ধরে বুকে-মুখে ঘষে দিতে থাকল তার দীর্ঘ নাসা এবং ডান হাতে চাপড়ে দিতে থাকল সাদ্দামের সহনশীল পিঠ, তার কাঁধবাহী ঝোলাটা-যে দু'জনের মাঝখানে পড়ে গিয়ে চিড়েচ্যাপ্টা হতে চলেছে, আবেগের প্রাবল্যে তা বোঝার সাধ্যটাই হারিয়ে ফেলল সে, ঝোলাটাকে সে ভাবল সাদ্দামের ভুড়ি, কাজেই চাপ, চাপ, মনের মাধুরী মিশিয়ে চাপ, কাণ্ডটা ঘটল ঠিক তখনই, হঠাৎই শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ, আ ফ্রেন্ডলি-বোম্বিং, মালটা ছিল ঝোলার ভিতরেই, তাজা, মুহূর্তে দু'জনই খানখান, ছিন্নভিন্ন, তুলোধুনা, এখানে মাথা তো হাত-পা গজ বিশেক দূরে, মাঠের গা ঘেঁষে থাকা শিশুগাছের পাতাগুলো বোম্বিংয়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে থাকল, গোধূলির আলো-আঁধারিতে পশ্চিমাকাশে তখন দেখা গেল এক দঙ্গল হিংস্র শকুন, যারা এদিকেই ধেয়ে আসছে

গাণ্ডীব

গল্পের নায়ক আলপথ ধরে নেমে এল গল্প থেকে, হাতে তার টইটই সুরে ভাসা কৌমের বাঁশি, কোমরবন্ধে জড়িয়ে সে প্রাকৃত ঘোর, চষে গেল কদিনেই শহরের বড় রাস্তারাজি

বাঁশি বাজল না

অন্ধকারে কজন লোক তাকে ডাকল মৌনস্বরে, কান নয়, হৃদয়তন্ত্রীতে সে স্বর যখন বাজাল স্যোনাটা, থমকাল সে অভ্যস্ত নয় বলে এমনতর ডাকে, সংশয়ে অতঃপর তাকাল দিগ্বিদিক, তবু আরেকটু কাল খুইয়ে সত্যটা বের করে নিতে সায় পেল না নিজের থেকেই, বলল না তবু, কথাটা সে বলল না আকাশ কিংবা বক্ষোপরে জ্বলে ওঠা বিশাখা তারাকে

বাঁশি বাজল না

সে বললে পারত যে আমি আমাকেই খুঁজি, অথবা তোমাকে, যেজন লুকিয়ে আছে আমারই ভিতরে, আর সেটা হতে পারত অনেকার্থকতাময় ক্রিয়াভিত্তি করে

বাঁশি বাজল না তবু

একরাতে, যে ক্ষণে সে হাতে এনে ধরেছিল মনে রাখা ছবি, ঢল নেমে সেটা যেভাবে ভিজিয়েছিল জোছনা-বৃষ্টিরা, সুরঘন সেই রাত ফিরে কি আর এল, বরং সুরালোয় স্নানপাট মহার্ঘ্য লাগে বলে গোপনতন্ত্রীতে তার গ্রামদেশ বড়োসড়ো টোকা দিয়ে গেল

যেকোনো শব্দেরই ভিন্ন অনূদিত অর্থ থাকে, যেকোনো ঘটনার, যেকোনো তাকানো বা সহসা ছোঁয়ার, এহেন ভিন্নার্থ তাকে উস্কানি দিল পেছনে ফেরার, কঠিন বাস্তবে দাঁড়িয়ে যদিও সতত মনে হয়, চর্চিত ভাষার চেয়ে বক্তব্যের সাথে গাঁটছড়া বেশি থাকে আনাড়ি কল্পনার

গল্পের নায়ক অবশেষে গাঁয়ে ফিরে বিশাল এক প্রান্তর বাজিয়ে গেল গাছপালাসহ, বিরাজিত মাটিজলময়

ব্যাস

টিনএজ যাকে বলে, সেই কাঁচা দিনেরাতে, নিজেকে সে কত যে নাগরী রূপে ভেবেছে গোপনে, কিন্তু নাগর তার দিকে কখনোই তাকায় নি প্রাণখুলে। প্রতিবিকেলে নাগরের বুকে নিজেকে আমূল সঁপে দিয়ে দিত,সে চিৎসাঁতার, যদিও বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার জো ছিল না সেটার। পাড়ে দাঁড়িয়ে 'এবার ওঠ তো মা, অনেক হয়েছে', কিংবা 'লক্ষী মা আমার, আবার-না ঠাণ্ডা বাঁধিয়ে বসিস, ওঠে আয় মা' বলে বলে পাড় মাতিয়ে তুলতেন তার বিরলা জননী। আরো কত কী যে ছিল তাদের শৃঙ্গারমালায়— সুযোগ পেলেই পা ডুবিয়ে তীরে বসে থাকা, স্পিডবোটে দূরে কোথাও ভেসে যাবার বেলায়ও পাঁচ আঙুলে জলের সাথে পরকীয় জানান রক্ষা করে চলা।

বহুবার সে চেয়েছে যে নাগর তাকে ষোলআনা গ্রহণ করুক, কিন্তু একটু একটু করে মনে রঙ লাগতে লাগতে পুরোটা রঙিন হওয়া পর্যন্তও নাগরের প্রকৃত সায় মেলে নি। নাগরীর প্রত্যাশিত সে মহান মৃত্যু হয়েছিল, পড়ন্ত যৌবনে, যখন গায়ের রঙ অনেটাই পুড়তে লেগেছে। সেটা ছিল মায়ের বুকে মুখ গুঁজে, স্বপ্নে। বক্ষের অবারিত উম দিয়ে অভিমানী অশ্রুভেজা মেয়েকে জাপটে ধরে নিয়েই মা ক্রমশ নামছেন গিয়ে নাগরের বুকে, একটু একটু শীত বোধ হচ্ছে তার, উম থেকে সে রিমুভ হচ্ছে একে একে। এক মিশ্র অনুভূতির আচ্ছন্নতায় মুখ তুলে টু শব্দটি পর্যন্ত করে নি সে। এভাবে তলাতে তলাতে শেষে তলানিতে, চলনবিলের সাথে ল্যাপটে যাওয়া ভরাবর্ষায়। ভীষণ ঠাণ্ডায় সে শেষে জেগে গিয়ে ঠকে, কারণ জাগ্রত তাকে পরে ফিরিয়ে দিয়েছে সবে, নাগরমহলে ছিল বসন্ত যারাই।

এহেন উমশীতলতা বড়ো ইটাজঙ্গলে নেই, আছে জল-মাটি-ঘাসে, মায়াবি মফঃস্বলে। সেবার তরুণী বয়সে, ঘোর যমুনার তীরে, খোঁপায় তিনটে প্রাণকাড়া রঙিন ফুলপরা মনোরঞ্জিত সে শাদা শাড়ি। মায়ারোদ মাখা বিকেলের গা ছুঁয়ে দিতেই তার বাইরে বেরোনো, সেটা ছিল বস্তুত নিজেকে ছোঁবারই এক ধরনের লুকোনো প্রয়াস। দিনে দিনে সে যে ফুটছিল পুষ্প সমতুল হয়ে, একটু একটু করে, মোহিনী গন্ধভরা সেই দেহাধারের থই থই কল্লোলই উসকে দিয়েছিল তাকে আয়নার বদলে অন্যের চোখে তাকিয়ে অভিব্যক্তির বর্ণমালায় একবার নিজেকে পড়তে।

সেবারই প্রথম সে বোধ করে শিহরণ, জেগে উঠে কবোষ্ণ 'আমি নারী'-বোধে, শীতনিদ্রা ভেঙে আসা ঘাসফড়িঙের মুখে 'অবাক সুন্দর' শুনে। আহা তার পরম আদরে পরা টিপ! আহা শিল্পযতনে আঁকা মায়াবি কাজল! জগতের সমস্ত লাজ তখন ভর করেছিল এসে তার গায়ে, মনে উষ্ণ আবেগ মজুদ, তবু কী যে এক পালাই পালাই ঘোরে পায়ে জেগে ওঠে যত অচেনা মুদ্রারা। আজ মনে হয়, ফড়িঙের নিত্য ওড়াওড়ি স্থল গহীনাঙ্গনে হলে, ঝাঁকে ঝাঁকে কামনা ঝরত বহু লতাসঙ্গমে, ডানাঅলা সেইসব দিনে।

আজ যে সে থেকেও নেই, এই আপাতমৃত্যুর ধারণাটি পেয়েছিল সে গাছপ্রেম থেকে। নাগর যেখানে বাঁক নিয়ে গেছে ইউকাট হয়ে, ফোকরে জল রেখে, তারই এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওই শতবর্ষী গাছ। যেদিন কাটা পড়ল প্রিয় তেঁতুল, চাচার নাছোড় জেদে, পোকায় খাওয়া শ্বাসমূল দেখে ওর, কষ্ট পেয়েছিল খুব। নিগৃহীত বাতাস ও ভালোবাসার ওজনে ওর বিক্রয়মূল্য স্থির করা কিছুতে চলে নি। কিংবা ঘনআত্মীয় যে ধবল বক অথবা কাঠবিড়ালি, তাদের আশ্রয়ের মূল্যমান মূল অঙ্কে কখনোই যোজিত হয় নি। সেই হারিয়ে ফেলানোর বেদনাকে তখন কে আর থামায়, এক নাগরের বুক ছাড়া ? নিত্য নিদান তার ছিল ওই নাগরেরই বুক, আজ তার বক্ষে শুধু গনগনে চুলা।

ব্যাস

কথাগুলো বারকতক বলা হয়েছে বলে অন্য কোনো শব্দসংগঠনে বা উপায়প্রয়োগে, বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে যা তা বোঝানো যায় কি না, এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে বিস্তর রাত ভোর হয়ে গেছে তার, কিন্তু খোঁজ মেলে নি। যে কারণে মাঝেমধ্যে চলাকথায়ই ভাবনাটা বলেছে। আজ বলবে না তবু, এ প্রতিজ্ঞায় পুরোমাত্রায় বদ্ধমূল হয়ে, সাদার দিকে চোখ গেঁথে কেন্দ্রের চারপাশে মনের রঙে আঁকছে এক গোলাকার বৃত্তবোধ, প্রকৃত অভিনিবেশ এখন দৃষ্টিগ্রাহ্যতায় নেই, আছে আরো দূরে ও গভীরে। মনোগ্রাহী ও নিষ্ঠ এ কালখণ্ড বয়ে নিয়ে আসতেও পারে অপ্রদেয় কোনো পুরস্কার, আনকোরা কোনো পথ, সুপথ, সে ভাবে, যে পথে সরসর করে বেরিয়ে আসবে না-বলা কথা, অকথিত অনুভূতি, নিবেদনের বৃক্ষবৃত্তান্ত।

অগণনীয় আঁধার ও তার আয়তনজনিত মূহ্যমানতা চিরে আসা আলোকের গোলকধাঁধায় বিবস্ত্র রাত অমীয় নন্দনতারল্যে ভাসমান। যে কখনো জানে না কবে শিল্পসকাশে যাবে আরূঢ় সুন্দর, সেমতো সাঁকো নেই, সেমতো খলবলানি, আলোদের, নেই ত্রাসস্তব্ধ পৃথিবীতে শান্তির ফুরসৎ।

অপেক্ষা উদ্বোধিত হয় কষ্টে সংগৃহীত কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে অপঠিত বইয়ের মতো, যেন শব্দ-বাক্যেরা ধ্বনিত হচ্ছে শুধু কর্ণে পশছে না ; বিবাহআসরে বসে ফুটফুটে সন্তান কামনার মতো, যেন মেঘ ভেঙে জল ঝরছেই শুধু মাটি ভিজছে না— এসব উপমোৎপ্রেক্ষায় ঘন ঘন 'মতো-যেন' জাতীয় তুলনাবাচক শব্দ ফুড়ুৎ করে ঢুকে যাচ্ছে দেখে দমে যায় সে, কারণ বলাভঙ্গিতে কথা বললে আজকাল টানটান মানুষ হওয়া যায় না, কবি তো দূর অস্ত। কত ধরনের টানটান আভিজাত্য আজকাল বলার-লেখার, তার চে' বেশি আর ক'জন জানে, সে তো প্রতিদিনই অনেক পাতা উলটায় কাগুজে গ্রন্থ মায় জীবনগ্রন্থের, তার নখদর্পণে আছে অনেক জনের লেখা-চলা-বলা— উদয়, গ্রহণ ও অস্তের আহাজারি।

কখনো সে রাতকে পাহারা দেয়, গোটা শহর চষে ফেলে, পেছনে পড়ে থাকে সিফন শয্যার উম, ছবি আঁকে জ্যামিতিকে হার মানা— কত বিচিত্র লাগে সব দেখতে-শুনতে, কত বিচিত্রই-না হওয়া উচিত। একেকটা দৃশ্যবর্ণনা যেন পথবেশ্যার ময়লা স্তনের মতো, নির্যৌন শীৎকারের মতো, রাতকে ফালা ফালা

করা হুক্কাহুয়ার মতো। আবারো মতোকথা চলে আসে দাঁত বের করে, বিরক্তিতে শেষে ছবি আঁকাকেই জরুরি মনে হয়ে যায়, চিঠি লেখাকে, অথচ কখনো সে ছবি আঁকে না, বস্তুত চিঠি কাল লিখলেও চলে, যতসব পলায়ন ঘোর।

একসময় মনে হয়, তার বলবার কথাই কি আসলে নেই ? বিষয়ভাবাপন্ন এই দেশে বিষয়হীনতাকে কেউ কোনোদিনই আমলে নেবে না, বলবে যাচ্ছেতাই শব্দ খেলেছে। শব্দে শব্দে জড়াজড়ি করে ধরে আছে কত যে বিষয়ের অন্তত কঙ্কাল, এ তথ্য ক'জন বের করে নেবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ? আতঙ্ক জাগে মনে, আতঙ্কে সে রুই-রুই উড়তে দেখে বাতাসে-বাতাসে বিষয়ের রেণু, এবং ভাবে, ওই উড্ডয়নক্ষম বিষয়রেণুই বস্তুত সবকিছু, যা এখনই বিষয়রূপে আছে, তাকে বিষয়ী করে তোলা কোনো কাজের কথা নয়। বিষয় ছাড়িয়ে যে বিষয়হীনতা, তার চাষাবাদের সমূহ সম্ভাবনাকে বিষয়ের এক-এক খণ্ডরূপে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সারে, বিষয় সমীপবর্তী হলে, তবেই বলা-কওয়ার থেকে যেতে পারে কোনো কার্যকর মানে।

শব্দ ভাঙে, শব্দ জোড়া লাগায়, তার সমবায়ে দেয় নতুন ছন্দনাচ। মোক্ষম বলাটা হয়ে গেলে ঠিক নড়ে ওঠে, চড়ে ওঠে, এ যে প্রাণের অধিক কেমন অন্য আরেক প্রাণ, যারা একে নাড়িয়ে চাড়িয়ে জানে, তাদের আসে অনুভূতি। আর চেয়ে দেখে একে একে সে মরে যাচ্ছে, বলতে গিয়ে যে সমূহ প্রস্তুতি, তা সেরে ঠিক বলবার মুহূর্তটি পর্যন্ত অপেক্ষায় অপেক্ষায় তার সব শুকিয়ে যায়। সে তখন মৃতবৎ হয়ে যায় এবং যা খুশি বলে, যেমন তেমন করে বলে। ওটাই তখন হয়ে ওঠে বিশিষ্ট এবং সে মৃত্যুকে জীবনের জন্য বরণ করে নেয় অনিবার্য ঘুমে।

ব্যাস

প্রথমেই চোখে পড়ে ঘাসায়িত ছায়া, যে দুপুরে বাতাস ছিল মৃদু কম্পনসহ, কুহুটুহু তো ছিলই, মননের মূর্ছনামুহূর্তব্যাপে বাহারি উল্লাস, দিগন্ত জেগে ওঠে আত্মআয়নায়, এটি কোনো রন্ধনকার্য বা প্রণালি নয় তাকাগি ক্যায়জুর, আগুনে মূর্তিত ধাপ ধাপ সিঁড়ি, এক পদে দুই পদে চূড়া, চূড়া থেকে পৃথিবীর রূপারূপ ছোট হয়ে যায়

অহঙের ব্যাখ্যা হয় আত্মজনোচিত

২.

এরপরও কিছু কাজ বাকি থেকে যায়, এরপরও, সৃজনী পাথরগুলো একে একে গেঁথে নিয়ে যে প্রাসাদ স্বপ্নে গড়েছি এতকাল, তারে দিতে হবে দৃশ্যগুণ, দূর পাহাড়ের থেকে পাখা মেলে যে পাখিরা এইদিকে, বাতাসের পাশাপাশি ধাবমান, তাদের বিশ্রাম লাগি উপরে বানাতে হবে কূজনিত চূড়া

হাজার বছর ধরে জমা যত মানুষের সুখ, যা ছিল হাস্য-আনন্দফুল, আর যত দুঃখকথামালা, আশাবরি পাখা, আমার প্রাসাদে ওরা রয়ে যাবে, আমি কান পেতে রব, আমি ঘুমাব না, মানুষের এতকিছু সুখ-দুখ, এতকিছু কামনা-বাসনা যদি আমার প্রাসাদে থাকে, পাথরখণ্ড জুড়ে যদি থাকে স্পর্শেরা, নিজের করে কিছু চাই না হে

এ-ও ভাবি, এতসব গীতিময় হাহাকার পৃথিবীর, এতসব চিৎকার চ্যাঁচামেচি পায়ে ঠেলে আমি একা গোপন প্রাসাদ গড়ে কোন সে সুখের দেব ডিম, হা-হা ডিম, হাতি নয় ঘোড়া নয় মানুষের ডিম, সেই ডিমে কোন সে মানুষী এসে তাপ দেবে, সেবা দেবে, তার থেকে বের হয়ে তেপান্তরের মাঠে উড়ে যাবে কেমন সে পাখি, তারে ধরব কেমনে বল বাঁধব কেমনে

পাখিদের পাখা হলো সব, পাখার মুক্তি তার বৃথা গেলে, মিছে হয় পাখির জনম, এই হলে আমি তবে ডিম দিয়ে করব কী, করছি কী, এর চেয়ে হাতে পায়ে শিকল প্যাঁচিয়ে থাকা ঢের ভালো, আরো ভালো নিজে উঠে পরকে বসতে দেয়া, ডিম নয় পাখি নয় নিজেদের করে, অপরের সবগুলি কান্নাকণামালা, নিজস্ব বোধ দিয়ে ছুঁয়ে

ছেনে দেখা, বাহারি প্রাসাদ গড়া ও অন্যকে ছেড়ে দিয়ে দরোজায় সযতনে নির্ঘুম থাকা, এইসব কাজ আমার বাকি রয়ে গেছে

৩.

থামো মুঠো মুঠো, রাশি জল রাশি আলো, কেন্দ্রিত ছিলে যাহা জগদীশ্বরে, নিসর্গ চুম্বিত বনে, বর্ণিল বহু আলেখ্য গানে, বাঁকে বাঁকে তেলে আর জলে, যাকে বলে মিইয়ে পড়া ভবিষ্যৎ, যাকে বলে মরে পড়ে থাকা, স্তব্ধ বেহুশ ঘুমে আলুথালু, মনের মরমিপনা চেপে রেখে, আলোর চেরাগগুলো দুইহাতে স্থির

কী তবে মুখর দিনের ভোরে জেগে উঠে বাতাসে সৃজনবীণা বাজানো, মহীয়ান কীসে হওয়া তবে, কর্মগাথাগুলো বিস্ময়ে সাধা, সুরকণা ভাঁজে ভাঁজে যদি থাকবে না, কোন আড়ে গাঁথা তবে সৃজনের চাবি, চালের বুতায়, কলকল নদীর সাম্পানে, ধোঁয়ার জ্বালা লুকিয়ে গতরে তবু, ঠমকে চমকে বেড়ে ওঠা, জেগে-ফুঁসে মহীয়ান নই যদি, আমি তবে ঘোরগুলি কীসে অনূদিব, গাইব কীসের গান, কেন গাব, যদি মহিমাই চিত্রিত নেই, শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই যদি...

আনি শুভ্রতা নদীর তীরের দেশে ঘুমুতে বানের জলে, এইকথা কানে কানে শোনা গেছে, স্বপ্ন রচনা করতে ফিরে গেছে পিতার জেদের ঘুড়ি, মাঝপথে সুতা ছেঁড়া একটি গাছের জন্ম প্রশ্নের মুখোমুখি ফেলে রেখে নিষিদ্ধ আনন্দ লাগি রাত জাগি, সবাই নেশার পাগল যদি কাজ তবে কারা করে যাবে

কোনো বলা-কওয়া নেই, বাচালতা নেই, লিখে যেতে হবে, লিখে লিখে কোনোমতে, ঘোর জন্মের মতো, কল্লোল জাগাতে হবে বনে বনে, কাহালু হৃদয় স্রোতে, রূপসংকট বেলায়, স্বরূপের মহিমাই বড় হয়ে ওঠে

শহুরে কুকুরকুলের গলাবাজিগীতি, তার সাথে পেরে ওঠা লাগে, অচিৎকৃত সুরে সুরে ভাসানো মন্দিরে ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকে বাসন্তী দিন, ফাগুন ভরা দিঘিতে নেমে ডুব দেয় গহন কষ্টেরা, তবু হৃদয় দেবার বেলা আশঙ্কায় কলাপাতা মন কাঁপে, ঠিক সন্ধ্যাবেলা বুকে এসে লাগে ঘোর ছ্যাঁকা, ঠিক বুকে লাগে, রক্তপ্রবাহে ভেসে যায় অবিনাশী হৃদয় ফোরাত, কী করে মিটবে তবে দূরাগত পথিকের পানীয় তৃষ্ণা

৪.

জয় হে মঙ্গলাচরণ, জয় হে নিজাধীন মন সদা প্রফুল্লতা, জয় সৃজনে ডুবে থাকা টুটি চাপা রাত, জয় তথাকথিত আনন্দ ক্ষণের স্তন

যে যারে ভালো জানে সে উৎসাহী চঞ্চল, যে যারে জেগে রয় ভাবে সে রুচিবাগীশ, যে যারে অবজ্ঞা হানে সে যোগ্য নয়, হেন কাজে মক্ষিকা গুন গুন, বাগান ত্যাগিয়া আসে নিবিড় সঙ্গমে, দূর নয় কাছে, রূপার কলসিতে সুপেয় যে জল, সে জল পিয়াতে লাগে হাসিত বেদনা, সহজে বিকিয়ে যাওয়া উত্তাপ নিয়ে বনের ভাদরগুলো, চনমন স্বস্তির গায় ভেজা গান

রক্তিম জানান যেটা, আমিও মশগুলা চারপাশে, আমিও তাড়িয়ে খুঁজি পথ, পথ মানে সামনে চলা যুদ্ধ করে করে, রাত জেগে এইসব পথচলা গবেষণা জরুরিই, প্রয়োজন বিশাল প্রান্তরে নিজেকেই অশেষ সন্ধান, নিজেকে জানার এই চেষ্টাটা কালে কালে ছিল, সবাই কেননা বুঝে নেয় তার মতো করে, এরা সব পায়ে ঠেলে, নিজেই নিজেরে ধরে মারে, সবার জন্য মাগে দাঁড়িকমাশ্বাস, উল্লাস ঘনঘোর, শেষে নিজের জন্যে শুধু 'কিছুই না' থাকে

ভীতি-সংশয় আর তাদের অনায়ত্ত ছানাপোনারা শুভযাত্রা আগলে দাঁড়ায়

দলেবলে জেগে ওঠা সম্ভাবনার পেছনে কত কী যে বাক্যালাপ ধ্বনিত-রণিত, অমিত ও ভীতিসঞ্চারী, এরকম ভয়ের সমুদ্রে জানি আগেও ভেসেছি, এরই মাঝে খুঁজে নিতে হয় কাম্যঘোর, সৃজনবিন্দুর দিকে নিহিত চিত্রিত গূঢ়পথ ধরে শাসন-ত্রাসন চলে ছদ্ম-পরিচ্ছদে, যেভাবে শিকারি শাসায় পাখি আর কাঠুরে বৃক্ষকে, পরিপাশে আজকাল এতসব... কেবলি সন্দেহ, বেখেয়াল রাত জুড়ে সৃজনমুহূর্ত বড়ো ফুরায়েছে তাই, গিজগিজ এটা সেটা এখানেও দানা বেঁধে থাকে, ভোরে খুব, দুপুরে-বিকালে আজ, কাল বা পরশু-তরশুর প্রতিটি প্রহরই ভয় সংক্রমণের

তবু তাপ আসে মেতে ওঠবার কঠিন কালের ঘাড়ে চেপে, তথ্য-অতথ্যবিস্ময় ঘিরে পাতা থাকা আড়ি ভেদ করে, কস্মিন সন্ধ্যায় এরকম আর কবে ঘটেছিল খুঁজে দেখি, রোদের আগল খুলে কবে বের হয়েছিল আমোদের শাক, গরম ভাতের সাথে— এই যে পাঠবস্তুহীন বড়ো আজেবাজে রাত পুকুরপঞ্জরে নামে স্নানে, পঙ্কআয়না ঘিরে সুললিত অমরাকে এঁকে রাখে ঝাঁপসা ঘোলাটে, যেখানের ঘোরগুলি অবজ্ঞায় মরে পড়ে থাকে

অকৃত্রিমতাকে যখন প্রশ্নার্ত হতে হয় অকাম্য সে স্থানে কারো অপেক্ষার প্রশ্নই আসে না, কে ওদের বোঝাবে যে ধ্যান হলো মহার্ঘ্য অতি, এটা হলো ভিতর দিক থেকে এক ধরনের জেগে ওঠা, সব শ্রুতিগ্রাহ্যতাকে দৃষ্টিগ্রাহ্যতার সীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া এবং দৃষ্টিগ্রাহ্যতাকে শ্রুতিগ্রাহ্যতায়— সবার ভাবনাচূড়ায় সুগন্ধি পুষ্পেরা ফোটে না, বয় না আঙিনা জুড়ে সুমন্দ হাওয়া, বোঝে না যে কবিকে কিছু বিচিত্র সময় চৌচির রাত উপহার দেয়া-থোয়া মন্দ নয়

যেরকম প্রস্তুতি থাকে হয় না সেরকম কোনোকালে, প্রস্তুতিকে ঘিরে মন যেরকম ক্রিয়াফল প্রত্যাশিত জানে, তার কম-বেশি নসিব হলে একটি মামুলি শব্দও গূঢ়ধ্যান ভেঙে দিতে পারে, একথা তখন ঠিক বলে দেয়া যায় যে এ পোড়াবাজারে একটি চুলের ঝরে যাওয়াও কম কিছু নয়, যারা এটা নিয়ে ধুমসে মজা করে তাদের ধুনে তুমি এরকম অঙ্কেরই ল্যাঠা দিও হে প্রভুপ্রকৃতি— এরকমও কেউ কেউ ভাবে যে করে দেবে দীনলীন, নানারঙ অনুমান ফাদে বিবিধ আঙ্গিকে, নানা ঘরানার ছবি এঁকে নিজস্ব বিভ্রমজালে নড়েচড়ে বসে, মহিমাই বাড়ে তাতে মহিমাই বাড়ে, রাত তিনটা শুনে চমকে ওঠে একজন, তার বিস্ময়মাখা চোখের দৈর্ঘ্য আঁকতে চাওয়া হলে যতখানি ধৈর্য্য লাগে ততখানি আপাতত এখনো পারি না

মাথার ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে যারা শ্রেণিরেলে, ওদের কী মনোভাব জানা থাকা ভালো, আঁকতে ধরতে আমি সেটাকেও চাই, তুলে এনে বুনে যেতে চাই কিছু কাগজে কলমে, এটা ঠিক আঁকা হলে, অতগুলো মানুষের মনোভাষ ছায়া, বিশালায়তন এক কাব্য করা হয়

এটা কি চিড়িয়াখানায় রাখা মানুষখেকোর কোনো খাঁচা, বিশাল থাবার ভয়ে দূর থেকে উঁকিঝুঁকি, আর শুধু রিউমার চারিদিকে, দিনে দিনে ঘটনার কিছুটা তো বদলায় তাতে, জন্মায় অঢেল ভঙ্গিরা দেখার, যখন মনে হয় না স্থির বলে কিছুকেই, বারেবারে প্রহসন চোখে পড়ে যে-বেলায়, তখন বেরিয়ে যাওয়াও আরো বিপদকে ডেকে আনা

এ শহর দুর্ভাগা চেনে না সৌভাগ্যের বরপুত্র ছাড়া, নতুন নতুন লোক আর ভিড় শুধু, কোলাহল হৈচৈ করে, এর মাঝেও উপলব্ধিতে সহজে যা না আসে তাকে ধরে আনা আর সঘন উল্লাসে রূপ দিয়ে বুকে বেঁধে সযতনে হাইব্রিড কথাজাল বুনবার শক্তি দাও, রূপজলে ধুয়ে ধুয়ে আলোর পশর, রূপদর্শী এসেছে যারা পৃথিবীতে, তারা অনেক বেশি নিজেদের বুঝোমন ভাবে, তবু শীত আর শীত মিলে কাঁপাচ্ছে হাত, দাঁত পাটি লাগে দাঁত পাটিরে

অযথাই ঠিকানা হদিস, যেন স্থাননাম মোটাদাগে ইমেজের রূপায়ণ সুনির্দিষ্ট করে রাখে, লোকজন এত রদ্দি আহা, তাকে নিয়ে আরো আরো কাব্য বিরচন করাই তো যেতে পারে, ওগো পাড়াপ্রধানেরা সতর্ক প্রহরী দিয়ে রুখো যতটাই, এ পাড়ায় আরো বেশি দেখবে চাঁদেরে, আচারে ও ব্যবহারে এতটা বৈচিত্র্য দাগানো যে এটাই সম্ভব ছিল, এটাও এক ক্রিয়ারীতি বলে কতজন আসে আসে, কতজন আসি আসি সকলেই ফিরে যায় শেষে

কবিকে নিরিখ করা পদার্থবিজ্ঞানভাষে কোনো কাজ নয়, কী করে কাজের বস্তু হব তবে, কী এমন যোগ্যতা অর্জিত হলো হাজারে হাজারে ব্যর্থ রচনার খসড়া করা ছাড়া, দিক-বিদিকের যত অঢেলতা তার প্রতি সমীহকে জি'য়ে রাখতে দেহ ও মনকে নিয়ে ফেলে রাখি ঝুঁকিঘরে, ভয়ানক লোকদেখা খেলি, লোকদেখা খেলে খেলে আজ এই লোকেদের পরিমেলে ডিম মামলেট খেতে গিয়ে পরোটার সাথে লাগে দুর্টিলে গিঁট

ক্যাথারসিস

এ চটির রচনারা
কোনো রূপকথার জন্ম দেয় নি উপজাত ক'রে, মিথেরও না,
যারা রচনারও আগে হেঁটে হাঁক দিয়ে
রূপকথা-আমোদীদের ঢেঁকির ওপর থেকে নামিয়ে এনে
পালানে রাখবে ঠায় হাসিমুখে দাঁড় করিয়ে।
এদের কোনো নিজস্ব অমাত্য নেই কিংবা বাণীবেরাদররূপী দূত।
রাজকবিয়াল নেই। সুধীমহলে কোনো জৌলুস নেই বিজ্ঞাপিত হয়ে।

এদের যা আছে
তার সবটাই সমাহিত
নিজ নিজ ভাণ্ডপরিসরে।
আছে—
জগৎসত্য, কলাগৌরব, নৈরাজ্যকলি, দর্শনবোধ, কামনিরীক্ষা,
শিষ্টক্রোধ, সুরাধিকার, সময়কচাল, ভাষাঘোর, আবিষ্কারানন্দ আর
'পাছে লোকে কিছু বলে' ধরনের দ্বিধামন্দচূর্ণ।

স্বভাবদোষে এরা শ্রবণ-দর্শন উভয় ইন্দ্রিয়কেই আক্রমণ করে বসে।
ত্যাজ্য হবার গৌরবে প্রথাশাসন থেকে দূরে অরণ্য হাসিল করে চলে
নিজের মতো একখানা ডেরা গড়বে বলে।